Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Issue-III, April 2023, Page No.91-98
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বিংশশতকে বিবাহবিচ্ছেদ ধারা: প্রসঙ্গ কয়েকটি মামলা

ড. মিতালী দে
সহকারী অধ্যাপক, বিধান চন্দ্র কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Marriage, though inherently considered to be a holy union between two individuals, loses its pious nature when it turns into abuse, mental and physical, leading to curbing of a woman's independence. This is when marriage-related laws come into play. It was with the joint efforts of social reformers and the British that 19th century witnessed the birth of a host of such laws, aimed at bettering the overall position of women in the society.

Abolition of Sati, child marriage, the Hindu Widows' Remarriage Act, the Indian Christian Marriage Act or the Native Marriage Act are a few noteworthy ones which paved the foundation of a stronger position for women in the society. It should be noted in this context that though since 1858, owing to Queen Victoria's announcement, the British did not involve themselves much with Indian social reforms, but it was with these laws that social reform had become an integral part of the freedom struggle.

This led to the Hindu Code Bill in an independent India. A part of this bill was the Hindu Marriage Act of 1955. A mention-worthy aspect of this law was divorce. It was through the provision of divorce that women had gained an alternative to voice their opinions, seek a way out in unhappy marriages. Thus, the topic of discussion would be analysing the divorce laws in light of a few specific cases, to see if it was actually able to free women in the real sense.

Keywords: Divorce, 19th century marriage laws for women, social status of women, marriage, Hindu code Bill.

বিবাহের অর্থ শুধু দুটি হৃদয়ের মেল বন্ধন নয়, দুটি পরিবার মধ্যে আত্মীয়তার সূচনা। এই আত্মীয়তা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে আরো অটুট করে। তবে শ্বশুরবাড়ির ব্যক্তিদের দ্বারা যখন কোন মহিলা চরম নির্যাতিত হতে শুরু করে তখন এই বিবাহ নামক পবিত্র সংস্কারটি তার তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে। আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। কিন্তু বিবাহ যেহেতু হিন্দুদের নিকট পবিত্র ধর্মীয় সম্পর্ক, সেই কারণে, আইনজ্ঞরা এই ব্যাক্তিগত ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের বিষয়ে খুব বেশি উদ্যোগী ছিলেন না। তাই দেখা যায় ১৯৫৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত সেরকমভাবে আইন প্রণীত হয়নি। প্রকৃতি পক্ষে শিল্পায়ন, নগরায়ণ প্রমুখের বিকাশের ফলে যে সামাজিক অর্থনৈতিক চরিত্রের পরিবর্তন হয়েছিল তার জন্যই আইনের প্রয়োজনিয়তা দেখা দিয়েছিল। তাই ১৯৫৫ সালে আইনের প্রণয়ন হয়। এই আইনের একটি ধারা ছিল বিবাহ বিচ্ছেদ। এই বিবাহ বিচ্ছেদের

ধারাটি আদৌ মহিলাদের নিজস্ব মতের ক্ষেত্রে তৈরি করতে পেরেছিল কিনা আলোচ্য নিবন্ধে আমি পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি মামলার প্রেক্ষিতে সেটি দেখানোর প্রয়াস করেছি।

প্রাচীন যুগ থেকে দেখা যায় সমাজ মহিলাদের কন্যা, বধূ, মা এই বিভিন্ন গতানুগতিকরূপকে স্বীকৃতি দিতেই বেশি পছন্দ করে। মহিলারা তাদের নিজের জীবনের পছন্দ-অপছন্দকে অগ্রধিকার দিতে পারবে না। সারাজীবন নিজেকে বঞ্চিত করে যেতে হবে, এক ছটাক কালিও যেন তার চরিত্রে না লাগতে পারে। তারা তো শুধু সন্তানের মা, এই তাদের পরিচয়। বিবাহের সামাজিক বন্ধনতো এই কারণে। কিন্তু সত্যিই কি মহিলারা এই জীবন চেয়েছেন? ঔপনিবেশিক ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যায় যে উনিবিংশ শতকের বাংলার সমাজে ব্রাহ্মরা কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে প্রথম 'বিবাহ' নামক সামাজিক সংস্কারের মধ্যে কিছু পরিবর্তন এনে বিবাহকে এক চুক্তির পর্যায়ে উন্নয়নের প্রচেষ্টা করেছিলেন। তাদের উদ্যোগে 'নেটিভ ম্যারেজ অ্যাক্ট (১৮৭২ সালে) এর সূচনা হয়। ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যরাও এই বিষয়টির সমর্থন করেছিলেন। ব্রাহ্মরা উপলব্ধি করেছিলেন যে বিবাহকেন্দ্রিক যে বাধ্যবাধকতা অবসানের জন্য কেবল মাত্র আন্দোলনই যথার্থ নয় এর জন্য প্রয়োজন আইন। তাই দেখা যায় ব্রিটিশদের সহযোগিতায় আইনের সূচনা। কিন্তু এতো গেল বিবাহ কেন্দ্রিক আচার পরিবর্তন বা সবর্ণ বিবাহ করার সুবিধাজনিত আইন। এর দ্বারা প্রচুর প্রণয় ঘটিত বিবাহ হতে শুরু করেছিল। বিবাহ আচারের সংস্কারের একটা ক্ষেত্র ব্রাহ্মনরা তৈরি করে দিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু ঔপনিবেশিক যুগে হিন্দু মহিলারা কি এই বিষয়ে নিজস্ব মতামত দেওয়ার ক্ষেত্রে তৈরি করতে পেরেছিলেন? তার উত্তরও পাওয়া যায় রূকমাবাঈ – এর ঘটনার মধ্য দিয়ে।

যদিও এটি বাংলার ঘটনা নয়। রূকমাবাঈ মহারাষ্ট্রের মেয়ে। কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে তার প্রতিবাদ সমগ্র ভারতে আলোড়ণ ফেলেছিল যার প্রভাব বাংলাতে পড়েছিল। একটি মেয়ের তার নিজের ইচ্ছা না থাকলে যে তাকে জোর করে শ্বশুর বাড়ি পাঠানো যায় না, সেই বার্তা রূকমাবাঈ তার প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছিলেন।আবার ১৮৯০ সালে ফুলমণির হরিমতির সাথে সহবাসের দরুণ যে মৃত্যু ঘটেছিল তার ফলে বাল্য বিবাহের বয়স ও সম্মতি আইনের প্রয়োজনিয়তা দেখা দিয়েছিল। তার ফলে হরবিলাস সারদার উদ্যোগে বাল্যবিবাহ নিরোধক আইনের সুত্রপাত হয়।

এভাবে ঔপনিবেশিক যুগের একের পর এক আইনের সাফল্য ও সেইসঙ্গে রুকমাবাঈ এর বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার দরুন দেখা যায় বাংলায় মহিলারা ক্রমশ বিবাহ নামক সামাজিক সংস্কার থেকে নিজেদের মুক্ত করার প্রেরণা খুঁজে পেতে শুরু করেছিল। যার উদাহরন হিসাবে ননীবালা গুপ্ত, লিলিয়ান পালিত, কুসুম কুমারীদেবী প্রমুখের কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যেহেতু বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে হিন্দুদের কোন সংগঠিত আইন ছিল না তাই 'নেটিভ কনভারটস ম্যারেজ ডিসিলিউশন (১৮৬৬) অ্যাক্ট', 'নেটিভ ম্যারেজ অ্যাক্টের' জন্য (১৮৭২ সালে) জন্য এইসব বিবাহ বিচ্ছেদ গুলি সম্ভব হয়েছিল। এসব প্রেক্ষিতে খুব স্বাভাবিকভাবে হিন্দু বিবাহ আইনের প্রয়োজনীয়তা দিকটিকে ত্বরান্বিত করেছিল যার ফলশ্রুতিতে হিন্দুকোড বিলকে কেন্দ্র করে প্রবল বিতর্কের পর ১৯৫৪ সালের বিশেষ হিন্দু আইন ও ১৯৫৫ সালে হিন্দু বিবাহ আইনের সূচনা হয়।

১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট ও ১৯৫৫ খ্রীস্ট্রাব্দের হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট উভয় আইনের একটি বিশেষ দিক বিবাহ বিচ্ছেদ। বিবাহ বিচ্ছেদ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজস্ব 'পার্সোনাল ল্য' দ্বারা পরিচালিত হয়। বৌদ্ধ শিখ জৈন প্রমুখদের ক্ষেত্রে হিন্দুবিবাহ আইনের (১৯৫৫ সালে) দ্বারা পরিচালিত হয়।

খ্রীষ্টানদের ক্ষেত্রে ১৮৬৯ সালের ডিভোর্স আইনের দ্বারা বিবাহবিচ্ছেদের বিষয়টি পরিচালিত হয়। আবার মুসলিমদের ক্ষেত্রে ১৯৩৯ সালে 'ডিসলিউশন অফ মুসলিম ম্যারেজ অ্যাক্ট দ্বারা এই বিষয়টি সফল হয়। সিভিল ম্যারেজ ইন্টার কমিউনিটি ম্যারেজের এবং বিবাহবিচ্ছেদের বিষয়টি ১৯৫৪ সালের স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টের দ্বারা পরিচালিত হয়। হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদ উভয়ের সম্মতিতে হয়ে থাকে। কিন্তু মুসলিম আইনের স্বামীদের কোন শর্ত বা কারণ ব্যতীত অতিরিক্ত বিচার সংক্রান্ত (Extra Judicial divorce) বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার প্রদান করা হয়েছে।[১]যাইহোক এখানে মূল, হিন্দু বিবাহ আইনের বিবাহ বিচ্ছেদের বিষয়টি কয়েকটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করার প্রয়াস করা হল।

বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ অনেকগুলি যেমন ব্যভিচারী, নিষ্ঠুরতা, পরিত্যাগ, অন্য ধর্মে রূপান্তর, পাগলামি, কুষ্ঠরোগে আক্রন্ত, সংক্রামক যৌন রোগ, কোন ধার্মিক সঙ্ঘে প্রবেশের দরুন সংসার ত্যাগ, সাত বছর কোন খোঁজ না পেলে, রেস্টিটিউশন অফ কনজুগাল রাইটসের আবেদন করার পর এক বছর অবাধ দাম্পত্য অধিকার পুনঃস্থাপন না হলে বিবাহ বিচ্ছেদ হতে পারে। এর বাইরেও বিবাহিত মহিলারা চারটি কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের বিশেষ সুবিধা পেতে পারে যা ১৩(২) নংধারায় উল্লিখিত আছে।

১. বিবাহের পর স্বামী যদি ধর্ষণ, পায়ুকাম, বা পাশবিকতার মত আচরণ করে, তার কারণে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের দাবি করতে পারে।
২. স্বামী যথাযথ ভরণপোষণ দিতে না পারলে বিবাহ বিছেদ দাবি করা যাবে।
৩. স্ত্রী ঋতুস্রাব হবার পূর্বে বিবাহ হলে তা বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ হবে।
৪. স্বামীর যদি অন্য স্ত্রী জীবিত থাকে তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ দাবি করতে পারবে।

তবে এখানে মূলত বিবাহ বিছেদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ব্যভিচার (Adultery) ও নিষ্ঠুরতা (Cruelty) বিষয়গুলিকে মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা হল।

ব্যভিচারের বিষয়টি মুসলিম পার্সোনাল ল্য ব্যতীত সব আইনে বিচ্ছেদের একটি অন্যতম কারণ হিসেবে পরিগনিত হয়। এটি এমন একটি বিষয় যা বৈবাহিক বন্ধনকে শিথিল করে দেয়। ঋকবৈদিক যুগ থেকে দেখা যায় বিবাহ আযদের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব এবং বিবাহ নামক সংস্কারকে বহন করার গুরুদায়িত্ব বেশি পালন করে মহিলারা। স্মৃতিকারকদের বিধান অনুযায়ী পুরুষরা এই দায়িত্ব থেকে শুধু মুক্তই ছিল না তারা অনেক সুবিধা ভোগ করত। তারা ইচ্ছে করলে বহু বিবাহ করতে পারত এবং তা সমাজে গৃহীত হত। বিধান অনুযায়ী পুরুষদের শারীরিক অক্ষমতা থাকলেও মহিলারা দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারত না। এমনকি স্বামী কোন অবিবাহিত মহিলার সঙ্গে সহবাস করলেও তার জন্য বিবাহিত স্ত্রীকে আলাদা থাকার ব্যবস্থা বা ভরণপোষণ দেওয়ার কোন নিয়ম ছিল না। অপরদিকে কোন মহিলা ব্যভিচারী হলে মহিলার স্বামী তাকে ভৎসনা করতে পারত। অপবিত্র মহিলার কোন দায়িত্ব স্বামী নিত না।

এখন দেখা যাক ব্যভিচারী মানে কি? ব্যভিচারিতার অর্থ হল বিবাহিত ব্যক্তি বিবাহিত হওয়া সত্বেও বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির সঙ্গে যদি অনবরত শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করা। ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৯৭ ধারা বলা হয়েছে ব্যভিচারিতা কেবলমাত্র পুরুষদের উপর আরোপিত হবে কারণ সে যদি সচেতন থাকে যে সে যেই মহিলার সাথে ব্যভিচারিতা মূলক কার্যকলাপ করছে তিনি অন্য কোন পুরুষের বিবাহিত স্ত্রী, তাহলে তিনি দোষী। অপরদিকে হিন্দু আইন অনুযায়ী ব্যভিচারিতা বলতে স্ত্রী বা স্বামী যদি অন্য কারো সাথে সেই ব্যক্তি (বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত) তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করলে তা ব্যভিচারমূলক

কার্যকলাপ হিসাবে গণ্য হবে। ভারতীয় দন্ডধারায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হিন্দু ক্রিমিনাল আইন শাস্ত্র অনুযায়ী (Jurisprudence) পুরুষ ও মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রে এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছিল। তবে ল্য কমিশন যা ভারতীয় দন্ডধারার খসড়া করেছিল তা মহিলাদের শাস্তি প্রদান থেকে মুক্ত করার কথা বলেছেন[২] এবার ব্যভিচারমূলক মামলা গুলি আলোচনা করলে এই ধারার আইনগত দিকটি বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে। খ্রিস্টানদের ১৮৬৯ সালের ডিভোর্স অ্যাক্টের ১০ নং ধারায় বলা আছে যে, স্ত্রী-স্বামীর ব্যভিচারিতার বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেনা। তার জন্য নিষ্ঠুরতা, ধর্ষণ, পুনর্বিবাহ এসব বিষয়গুলি অপরাধের ক্ষেত্র হিসাবে প্রমাণ করতে হবে; শুধু এই ব্যভিচারকে ভিত্তি করে মামলা করতে পারবেননা। এখানে আইনের দ্বিচারিতার বিষয়টি অনুধাবন করা যায় ডাউন হেন্ডারসন সঙ্গে ডি হেন্ডারসনে মামলায়[২] (১৯৬৯ সালে) দেখা যায় স্ত্রী ১০ নং ধারা অনুযায়ী স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল যে তার স্বামী তাকে বাধ্য করছে বারবনিতার জীবন বেছে নিতে এবং এটি তার স্বামীর তার উপর ব্যভিচার মূলক কার্যকলাপ। বিচারক বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন যে সত্যই তার স্বামী ব্যভিচারী চরিত্র সমপন্ন কিন্তু যথাযথ প্রমাণ নথিভুক্ত না করার ফলে তার আবেদন খারিজ হয়।

তবে ১৯৬৯ সালের শচীন্দ্র ও নীলিমার মামলাটা[৩] ছিল কিছুটা ভিন্ন ধরনের। শচীন্দ্র ও নীলিমা উভয়েই হিন্দু ও ভারতের বাসিন্দা। বিবাহের পর শচীন্দ্র তাকে পৈত্রিক বাড়ি বাকাল (Bakal) (বরিশালের একটি জেলা) রেখেছিলেন। বিয়ের তেরো দিন পর শচীন্দ্র নীলিমাকে রেখে কলকাতায় চলে এসেছিলেন এবং কলকাতায় এসে পড়াশুনা করেন। এত পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকায় স্বাবাভিক ভাবে নীলিমার সঙ্গে তার বৈবাহিক সম্পর্ক সেভাবে গড়ে উঠতে পারেনি।

খুব সম্ভবত ১৯৪৮ সাল নাগাদ নীলিমা পাকাপাকি ভাবে শচীন্দ্রর এসে থাকতে শুরু করেন। ইতিমধ্যে তাদের দুই মেয়ে ও এক ছেলে হয়। সকলে এক সাথে থাকতে শুরু করেন। কিন্তু হঠাৎ নীলিমার ব্যভিচারী চরিত্রের জন্য শচীন্দ্র জুডিসিয়াল সেপারেশন ও বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করেছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬১ সালের ২৮ শে জানুয়ারি শচীন্দ্র ও নীলিমার প্রথম মেয়ে তার বাবার বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে একবছর আগে তার বাবা তাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলেন। শচীন্দ্র গ্রেফতার হন ও পরে জামিনে মুক্ত হয়েছিলেন।

শচীন্দ্রর তার স্ত্রী নীলিমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন যে তার স্ত্রী সংযমহীন উগ্র যৌন আকাঙ্খাযুক্ত ও দীর্ঘদিন ধরে তিনি নীলিমার এই স্বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। কিন্তু ১৯৬১ সালের জানুয়ারি মাসে তার বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করায় নীলিমা মেয়ের সাহায্যে এরুপ মিথ্যা অপবাদ দেন। এর উত্তরে নীলিমা সব অস্বীকার করেছিলেন। এমনকি শুধু তাই নয় শচীন্দ্রর বড় দাদা জিতেন্দ্রর ছেলে গোপালের সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক আছে এরুপ যে অভিযোগ শচীন্দ্র করেছিলেন তাও নীলিমা অস্বীকার করেন। প্রকৃত পক্ষে তথ্য অনুযায়ী দেখা গিয়েছিল যে, গোপাল নীলিমার প্রতি দুর্বল ছিল। তিনি নীলিমাকে আসক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নীলিমা তার এরূপ আচরণকে কোনমতে উৎসাহ দেননি। তাই অপরাধী গোপাল, নীলিমা নয়। এই মামলার বিচারের ক্ষেত্রে বিচারক এই মত পোষণ করেছিলেন যে শচীন্দ্রর মত এত শিক্ষিত ব্যক্তি তার পত্নীকে এরূপ অপবাদ কি করে দিতে পারেন? এপ্রসঙ্গকে বলা আবশ্যক যে প্রমাণ সাপেক্ষে দেখা যায় যে শচীন্দ্রর নিজের বাড়ীর গৃহকর্মীর (misstress) সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল এবং নীলিমার অবর্তমানে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছিল।তাই মামলার সমস্ত

সাক্ষীদের মতামত গ্রহন করার পর বিচার বিবেচনা করে উচ্চ আদালত এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে নীলিমার দিক থেকে ব্যভিচারের কোন সম্ভাবনা নেই।তাই তার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের এর অভিযোগ আনার কোন প্রশ্ন উঠে না।

আবার দেখা যায় ১৯১১ সালে সংযুক্তা প্রধান বনাম লক্ষীনারায়ন প্রধান এর মামলার ক্ষেত্রে ।[৪] লক্ষীনারায়ন ইচ্ছে করে একজন বাক্তিকে তার স্ত্রীর গৃহে প্রবেশ করিয়ে স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের আভিযোগ আরোপ করে মামলা করেছিল।উদ্দেশ্য ছিল পিতা পুত্রসন্তান না হওয়ায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করা।কিন্তু তার প্রথম স্ত্রী সংযুক্তা তাতে রাজি না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন।কিন্তু এই মামলায় স্বামীর আবেদন স্বীকৃত হয়েছিল। ১৯২২ সালে রবার্ট সেবাসটানের[৫] (Robert Sebastian) সঙ্গে লিনেট সুবার (Linet suba) মামলার ক্ষেত্রে দেখা যায় উভয়ের সম্পর্কের জন্য স্ত্রীর প্রেমিকাকে স্বামীকে অর্থ জরিমানা দিতে হয়েছিল। এমনকি লিনেট তার সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব হারিয়েছিল যখন তিনি জানিয়েছিলেন যে তার প্রেমিকার সঙ্গে তিনি থাকতে ইচ্ছুক। অর্থাৎ স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি তাকে অন্য কেউ গ্রহণ করলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বিংশ শতকের প্রথমদিকে আদালতে বিচারের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগুলি কখনও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়নি। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী হিসেবে শচীন্দ্র ও নীলিমার মামলাটির কথা বলা যেতে পারে।

হিংস্রতা বা নিষ্ঠুরতা অর্থাৎ আইনগত নিষ্ঠুরতার বিষয়টি ঠিকমত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। সমস্ত মামলার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে এরূপ আইনগত নিষ্ঠুরতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা শুধু কঠিন নয়, দুঃসাধ্য ব্যাপার। 'নিষ্ঠুরতা' বলতে বোঝায় এমন এক কার্যকলাপ যার দরুণ প্রাণ সংশয় হতে পারে। নিষ্ঠুরতা শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকে আঘাতকারী একটি বিষয়। যেহেতু সমাজ ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছে তাই মনু বা প্রাচীন বিধানকারীরা যেভাবে নিষ্ঠুরতাকে বর্ণনা করেছেন সেই একই প্রেক্ষাপটে বর্তমানে নিষ্ঠুরতাকে দেখলে হবেনা। তাই স্বাভাবিক ভাবে নিষ্ঠুরতার সংজ্ঞাকেও পরিবর্তন করার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। তাই দেখা যায় হিন্দু আইনের বিবাহ বিচ্ছেদে নিষ্ঠুরতার বিষয়টি বেশ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। ১৯৭৬ সালের সংশোধনের পর নিষ্ঠুরতার বিষয়টি বিবাহ বিচ্ছছেদের অন্যতম কারণ হিসেবে গন্য হয়েছিল। এখানে আবেদনকারীর মানসিক কষ্টের কারণের বিষয়টি বাতিল করে নিষ্ঠুরতার সংজ্ঞাটিকে আরও বিস্তৃত করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের মতানুযায়ী নিষ্ঠুরতার ব্যপ্তি মানসিক ও শারীরিক উভয় হতে পারে এবং নিষ্ঠুরতার সংজ্ঞার বিষয়টি পৃথক পৃথক মামলার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হবে এবং সেই অনুযায়ী বিচার হবে।

নিষ্ঠুরতার ধরন: শুধু শারীরিক নির্যাতন নয়, কোন কারণ বশত স্ত্রী বা স্বামীর মানসিক সমস্যা হয় সেটিও হিংস্রতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন – স্ত্রী যদি শ্বশুর বাড়িতে যথাযথ সম্মান না পায় ও খারাপ ব্যবহারের সম্মুখীন হয় তখন তাকে পৃথক থাকার ব্যবস্থা না করলে তার উপর নিষ্ঠুরতা মূলক আচরণ করা হচ্ছে ধরা যেতে পারে। এমনকি কোন কারণে স্ত্রীর মর্যাদা হ্রাস করলে, বিরক্ত করলে তা আইনগত মানসিক নিষ্ঠুরতামূলক কার্যকলাপ বলে চিহ্নিত হবে। ১৯৬৮ সালে সপ্তমী সরকার ও জগদীশ সরকারের মামলার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি বোঝা যায়।[৬] জগদীশ সরকার তার স্ত্রীকে বারবনিতা, রাস্তার মেয়ে ইত্যাদি অপবাদ আরোপ করেছিলেন। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে সপ্তমী মামলা করেছিলেন। সপ্তমী ও জগদীশের হিন্দু রীতি অনুযায়ী বিবাহ হয়েছিল। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সম্মানজনক পরিবারের ছিলেন। তারা একান্নবর্তী পরিবারে থাকতেন। পরে সপ্তমী ও জগদীশ তাদের সন্তানদের নিয়ে পৃথক ভাবে থাকতে শুরু করেছিলেন কিন্তু

জগদীশের আয় সংসার চালানোর জন্য পর্যাপ্ত না থাকায় সপ্তমী বিক্রয়কারীর (Sales Girl) কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু সপ্তমীর চাকরি জগদীশের কাছে গ্রহণীয় ছিলনা। নিয়তির আঘাতে জগদীশের ব্যবসার ক্ষতি হওয়ায় তিনি বেকার হয়ে যান অথচ তিনি সপ্তমীর চাকরি করাটা মানতে পারছিলেন না। ফলে জগদীশ অশান্তি করা শুরু করেছিলেন। সপ্তমীকে তার সহকর্মীদের নিয়ে নানা কুকথা বলতে শুরু করেছিলেন ও মানসিকভাবে অত্যাচার করতেন ফলে সপ্তমী বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। এভাবে মানসিক অত্যাচার করতে থাকায় সপ্তমী বিরক্ত হয়ে প্রথমে 'জুডিসিয়াল সেপারেশনের' দাবি করেন ও পরে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করেছিলেন। বিচারকের মতানুযায়ী সপ্তমী কেবলমাত্র জগদীশের শারীরিক চাহিদা পুরনের মাধ্যম ছিল না। তিনি একজন পূর্ণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মহিলা তাই শুধু শারীরিক অত্যাচার নয় মানসিক দিক থেকে কষ্ট দেওয়া নিষ্ঠুরতার এক রূপ। সেই কারণে সপ্তমীর সঙ্গে জগদীশের পৃথক হওয়া ও বিবাহ বিচ্ছেদ হতে পারে।

অনুরুপভাবে ব্রজকিশোর ঘোষের সঙ্গে কৃষ্ণা ঘোষের মামলাতেও (১৯৮৯ সাল)[৭] দেখা যায় যেখানে কৃষ্ণার উপর ব্রজকিশোরেরমানসিক নিষ্ঠুরতার বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল। অন্য দিকে দ্বীপায়ন চ্যাটার্জী বনাম পাপিয়া চ্যাটার্জী (১৯৯০) মামলাটিতে[৮] দ্বীপায়ন চ্যাটার্জী পাপিয়া তার সাথে সহবস্থান করছিলেন না এই অভিযোগে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করেছিলেন। এই মামলায় দ্বীপায়ন পক্ষে রায় প্রদান করা হয়েছিল।

সুতরাং দেখা যায় যে, হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদের আইনে নিষ্ঠুরতার বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং এই বিষয়ের উপর মামলার পরিপ্রেক্ষিতে মহিলা ও পুরুষ উভয়ে বিবাহ নামক সামাজিক বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে আদালতে বিচারের ক্ষেত্রে কি সর্বদা নিরপেক্ষতা অনুসরন করা হয়, বিশেষত মহিলাদের ক্ষেত্রে। কারণ মহিলাদের সাথে পারিবারিক নৈতিকতার বিষয়টি অতপ্রতভাবে জড়িত। তাই সেই পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি বিভেদ পরিলক্ষিত হয় যেমন এই আইন প্রণয়ন করা হলেও বিচারের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অন্যরুপ। এখানে পরিবারিক নৈতিকতার প্রশ্নে মহিলাদের ভূমিকার সঙ্গে যথাযথ আইন প্রয়োগের মধ্যে একটি বিভেদ পরিলক্ষিত হয়। একই আইন প্রণয়ন করা হলেও বিচারের ক্ষেত্রে কিন্তু পরিস্থিতি অন্যরূপ হয়।

এই প্রসঙ্গে সান্ত্বনা ব্যানার্জী ও শচীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী মামলার (১৯৯০ সাল) উদাহরণ দেওয়া যায়।[৯] এখানে দেখা যায় সান্ত্বনা ব্যানার্জী তার স্বামীর বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আবেদন করা আপিলকে ভুল প্রমাণ করতে পারেননি। তার স্বামীর দাবি ছিল যে তার স্ত্রী একজন গৃহকর্মী হিসেবে জীবন যাপন করেছিলেন না। তার স্ত্রী যে একজন রেডিও আর্টিস্ট হিসাবে কাজ করেছিলন তা গোপন করে রেখেছিলেন তার কাছে। তার স্ত্রীর অন্য ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেন এবং শুধু তাই তিনি নয় তিনি সন্তান ধারন করতে রাজি হচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তার স্ত্রী সান্ত্বনাব্যানার্জী উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি মোটেই পারিবারিক কর্তব্যকে অস্বীকার করেননি এবং বাঙ্গালি গৃহবধূর মত তিনি জীবনযাপন করতে চাইতেন না এটি ভুল তথ্য। কলকাতার উচ্চ আদালতে কিন্তু তার স্বামীর মতকে সমর্থন করা হয়। এই মামলার ক্ষেত্রে নিষ্ঠুরতাকে অন্য দৃষ্টিকোণের মাধ্যমে বিচার করা হয়েছিল। সান্ত্বনাব্যানার্জীর 'সুপত্নী'রআদর্শে আদর্শায়িত ছিলেন না এই রূপ বক্তব্যকে আদালতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।[১০]

তাসত্ত্বেও বলা যায় ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইন উভয় বিবাহের ইতিহাসে এক জলবিভাজিকা স্বরূপ ছিল। হিন্দু বিবাহ আইনে প্রথম মহিলাদের আইনগত দিক থেকে বিবাহ নামক ধর্মীয় সংস্কার থেকে মুক্ত হওয়ার দিশা প্রদান করেছিল। এই আইন বহুগামিতাকে নিষিদ্ধ করে। হিন্দু সমাজের গতানুগতিক কুপ্রথার অবসান করেছিল।

বিধবাদের পুন: বিবাহকে স্বীকৃতি প্রদান করে। যদিও দ্বিপত্নীকরণ (bigamy)বিষয়টির ব্যখ্যায় হিন্দু আইনে কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তবু বলা যায় এই আইন দ্বিপত্নীকরণকে শাস্তিমূলক বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল। এমনকি বিবাহ নথিভুক্তর বিষয়টি গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

হিন্দু বিবাহ আইন পাশ হবার পূর্বে সেরকমভাবে বিচ্ছেদের বিষয়টি হিন্দুদের কাছে পরিচিত ছিল না। বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা হত কম, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রথা অনুযায়ী বিচ্ছেদের বিষয়টি পরিচালিত হত। আদালতে মামলা করার আবশ্যকতা দেখা দিত না।বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক অধিকার লাভ করার প্রয়াস খুব কম পরিলক্ষিত হত কিন্তু হিন্দু আইনের বিবাহ বিচ্ছেদের এমন ক্ষেত্র গুলি চিহ্নিত করা হয়েছে যে যার উপর ভিত্তি করে মহিলারা মামলা করতে সচেষ্ট হয়েছে যেমন ব্যভিচার ও নিষ্ঠুরতার ক্ষেত্রে আমরা এমন অনেক মামলা আলোচনা করেছি যেখানে মহিলারা আইনের মাধ্যমে সুবিচার লাভ করেছে এবং ১৯৭৬ সালে হিন্দু আইন সংশোধন হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের বিবাহ বিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি পেয়েছিল।তবে সাথে এটাও বলা আবশ্যক যে স্বামীর দ্বিতীয় বার বিবাহ নিয়ে খুব বেশি মামলা এখনও হয় না। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বাংলার ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে বলা যেতে পারে। মহিলারা স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে থাকতে রাজি কিন্তু আইনের সহযোগিতায় এই অবস্থার পরিবর্তনে আগ্রহী নয়। সামাজিক মূল্যবোধ সমাজের ঐতিহ্যের বাধ্য বাধকতার চিরাচরিত ধারাকে খুব সহজে আইনে পরিবর্তন করতে পারবে সেটি কাম্য নয়। তাই হিন্দু বিবাহের আইনের প্রয়োগের দিকটি আজও বেশ প্রশ্নের সম্মুখীন।

References:

1. Rajkumar Agarwal: Matrimonial Remedies under HinduLaw by N.M. Tripathi private Limited 1974, pp.170.171
2. Mrs. down Henderson Vs D.Henderson on 11th February 1969, Madras High Court, www.IndianKanon.org
3. Sanchindra Nath Chatterjee Vs.Smt. Nilima Chatterjee on 16 May, 1969, AIR 190 cal 38, 74 CWN 168, www.manuputra.com
4. Sanjukta Prdhan Vs Laxminarayan Pradhan : 1991, Orissa High Court, www.indiankanon.org
5. Robert Sebastian VS Linet Suba (1992). ২ Kerala High Court, www.indiankanon.org
6. Saptami Sakrar vs Jagadish Sarkar 1968, cal H.C., www.manuputra.com
7. Brojo Kishore Ghosh Vs Krishna Ghosh High Court case, Calcutta AIR 1989 cal 1327, www.manuputra.com
8. Deepayan Chatterjee VS Papiya Chatterjee, DMC 1990, cited in S. Samuel Kiran Kumar, Digest on Husband subjected to cruelty by Wife, for divorce and maintenance, National Law House, 1990, p-75.
9. Santana Banerjee Vs Sachindranath Banerjee [Dmc 1990(2), Calcutta High Court, cited in S. Samuel Kiran Kumar, Digest on Husband subjected to cruelty by Wife, for divorce and maintenance, National Law House, 1990 , p-40
10. Rooma Mukherjee: Women, Law and Free Legal aid in India : Deep and Deep publications, New Delhi, 2000, P-264